The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.165 - 176)
Published in February, 2025

পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নাসরিন আক্তার *

প্রতিপাদ্যসার: দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণসম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর নানা শাখা-প্রশাখা বিকাশ লাভ করেছে। এরই একটি নতুন সংযোজন হল পরিবেশ নীতিবিদ্যা। যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে সে পরিবেশ আজ মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের ফলে বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও সচেতন হচ্ছেন। এ সচেতনতায় যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তা থেকেই মূলত পরিবেশ দর্শন বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম। পরিবেশ সংকট মোকাবেলা করে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধে আমরা পরিবেশ নীতিবিদ্যার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় নীতিবিদ্যার গুরুত্ব আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

পরিবেশ ও মানবজীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রাচীনকাল থেকেই। ধারণা করা হয় মানুষ ও পরিবেশের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া প্রথম পরিলক্ষিত হয় ৭০০০০০ বছর আগে যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা আগুনের ব্যবহার শুরু করে। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন গ্রন্থ (সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ) বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচিত ছিল। প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেলের মত ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন সাহিত্যিক যেমন- রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, হোমার, কনফুসিয়াসের বাণীতে, এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায়, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির বিজ্ঞান চেতনায়, আল-বেরুণীর পর্যালোচনায় পরিবেশ ও মানুষের কথা, পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্বের কথা বারবার উঠে এসেছে। তবে পরিবেশ ও মানুষের বিস্তার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষ পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবছে, যা আগে ভাবা হয়নি। বর্তমানে পরিবেশের সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে বিধায় তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানুষ বেঁচে আছে পরিবেশের কোলে নিজেকে সমর্পণ করে। পরিবেশ মানুষের মৌলিক উপাদান ও চাহিদা নির্ধারণসহ সব ধরনের চাহিদা পূরণ করে। আমাদের মূল জীবনরক্ষাকারী উপাদান আমরা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকি। যেমন: শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু (অক্সিজেন), পান করার জন্য পানি, খাদ্য,ঔষধ, বস্ত্র, বাসস্থান, ভূমি ইত্যাদি। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এ পরিবেশে মানুষসহ অন্যান্য জীবমণ্ডল নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে। তবে কারো কারো মতে মানুষই হচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। তার বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য প্রাণীদের থেকে উচ্চতর বলে মনে করা হয়। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরুপ পৃথিবীর চেহারাও বদলাতে থাকে। প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক বাস্তুবিদ্যার নিয়মে পরিচালিত হতো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতার উৎকর্ষতার কারণে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে। যার কারণে মানুষ পরিবেশের অন্যান্য উপাদান থেকে আলাদা হয়ে যায়। মানুষ পরিবেশের একটি প্রভাবশালী প্রাকৃতিক উপাদান হয়ে উঠে। সে তার নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

থাকে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এটাই বলা যায় যে, মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস। তাই একথা বলাটা অত্যুক্তি হবে না যে, আদিকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে সুবিবেচনাপ্রসূত আচরণ করেনি। প্রকৃতিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। যার ফলে প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক ধারণাটি ছিল মূলত পরিবেশবিজ্ঞানীদের কৌতুহল এবং গবেষণার বিষয়। কিন্তু আজ আর বিষয়টি শুধু পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটা পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় প্রজাতির বিলুপ্তির রাসয়নিক পদার্থ ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে লেখা জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন এর 'Silent Spring' নামক যুগান্তকারী গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের বিশেষত DDT এর যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে (Carson 54)। তিনি বিশেষ করে ঈগল পাখী বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে DDT এর ব্যবহারকেই দায়ী করেছিলেন।

বর্তমান পৃথিবী পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত। যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে সে পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। মানুষের নানাবিধ কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশ ক্রমশ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের হ্রাস, জলবায়ুর পরিবর্তন, জীবমন্ডলের পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি, বনাঞ্চল হ্রাস, মাটি ক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ও এ পৃথিবী বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিকগণও সচেতন হচ্ছেন। এ সচেতনতায় যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তা থেকেই মূলত পরিবেশ দর্শন বা পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম।

১. পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপঃ

পরিবেশ নীতিবিদ্যার স্বরূপ জানার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে পরিবেশ কি, নীতিবিদ্যা বলতে কি বোঝায়। অতঃপর পরিবেশ নীতিবিদ্যা কি তা ব্যাখ্যা করা হবে।

পরিবেশ বলতে মানুষ, অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে জীবন্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন-চক্র পরিচালনার জন্য পানি, খাদ্য, সূর্যের আলো সবকিছুই বিদ্যমান। পরিবেশের মধ্যে জীবনধারণকারী এবং জীবন পরিচালনাকারী অন্যান্য সকল শর্তাবলি যেমন-বসবাসের স্থান, পরিবহন ব্যবস্থা, আলো, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

অন্যভাবে বলা যায়, জীব ও জড় পদার্থ নিয়ে পরিবেশ গঠিত। এটি জীবন্ত প্রজাতির টিকে থাকার জন্য এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আরও বিভিন্নভাবে পরিবেশকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমনঃ-

১. মানুষ এবং তার চারপাশের সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক, ভৌত এবং রাসায়নিক বিষয়াবলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।

২. কোনো জীবের চারপাশের অবস্থানকারী জীবিত ও জড় উপাদানগুলো এবং এদের মিলিত সব রকমের প্রভাব ও ঘটনা প্রবাহের সামগ্রিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।
৩. পরিবেশ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও জীব- জৈব উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও গবেষণার ফলাফল অধ্যয়ন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণ সর্ম্পকীয় বিজ্ঞান। আচরণের ভাল-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য এগুলো নীতিবিদ্যার বিচার্য বিষয়। মানুষের ক্রিয়া সমষ্টিকে আচরণ বলে। তবে নীতিবিদ্যায় মানুষের আচরণ বলতে ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও অভ্যাসজাত ক্রিয়াকে বুঝায়। সুতরাং দর্শনের যে শাখা মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান তাই নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যাকে Moral Philosophy বা নীতি দর্শনও বলা হয়। ম্যাকেনজী নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, আচরণের ন্যায় বা ভালো নিয়ে যে আলোচনা, তাকে নীতিবিদ্যা বলা যায়। এ বিদ্যা আচরণ-সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং এ বিদ্যা ন্যায় বা অন্যায় ও ভাল বা মন্দ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলীর আলোচনা করে। নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলিয়াম লিলি বলেন, নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের আচরণকে উচিত কি অনুচিত, ভালো কি মন্দ বা অনুরূপভাবে বিচার করে। সমকালীন দার্শনিকদের পদ্ধতিগত পদ প্রয়োগ করে নীতিবিদ্যার সংজ্ঞার নতুন সূত্রায়ন এভাবে করা হয়- নীতিবিদ্যা আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত দর্শনে নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা প্রধানত মানুষকেন্দ্রিক। কেননা, সেখানে কেবল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তাই নীতিবিদ্যার আলোচ্যবিষয় ছিল। অর্থাৎ সেসময় নীতিবিদ্যার সাথে মানুষের স্বার্থ আবশ্যিকভাবে জড়িত ছিল। তবে এ নীতিবিদ্যা অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তার মূল্যকে একেবারেই অস্বীকার করে না। বরং তারা মনে করে যে এগুলোর মূল্য অবশ্যই আছে এবং তা কেবল মানুষের মূল্যের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনে অ-মানব প্রাণী ও প্রাকৃতিক সত্তাকে ব্যবহার করবে। যদিও ধারণা করা হয় যে সনাতনী নীতিবিদ্যায় মানুষকে নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংস করতে উৎসাহ দিয়ে মানুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে একদল মানবকেন্দ্রিক পরিবেশ দার্শনিকদের মধ্যে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের দার্শনিকরা মনে করেন যে, মানুষের প্রয়োজনেই পরিবেশকে ধ্বংস করলে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হবে যা প্রকারান্তরে মানুষেরই ক্ষতি হবে। তাই এই ধরনের নীতিবিদ্যার সমর্থকগণ প্রকৃতি ধ্বংস নয় বরং মানুষের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন।

এটা সত্য যে মানুষের আচরণ শুধু সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের নানা উপকরণের সাথেও তাকে নানা রকম আচরণ করতে হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে নৈতিক নীতিমালা তৈরিই হল নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। বস্তুত মানুষের জীবনে পরিবেশের এসকল উপকরণের মূল্য অপরিসীম। এ মূল্য নিরূপণের জন্যেই সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। পরিবেশের প্রতি মানুষের আচরণের মূল্যায়নই এ নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য।

২. পরিবেশ নীতিবিদ্যা কী?

পরিবেশ নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Environmental Ethics'। এটি মূলত প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন। মানুষ যেখানে বসবাস করে তার চারপাশে বিরাজমান মানব, প্রাণীজগত, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বায়ুমণ্ডল, বাস্তুতন্ত্র এগুলো নিয়েই পরিবেশ গঠিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান মানুষ,

পরিবেশ ও অমানব বিষয়গুলোর মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক, মূল্য ও নৈতিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে। এ শাস্ত্র নীতিবিদ্যার গতানুগতিক মানবভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি অ-মানব সত্তা নিয়েও অধ্যয়ন করে।
পরিবেশ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যকার যে একটি নৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে। এটি মূলত পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ পরিবেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশের প্রতি মানুষের যে নীতিবোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এটি এমন সত্যকে তুলে ধরে যে, পৃথিবীর সকল ধরনের জীবজগতের জীবনধারণের ও বংশবিস্তারের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা এ সত্যকে অস্বীকার করি যা অনভিপ্রেত এবং অনৈতিক। খাদ্যশৃঙ্খল স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ নীতিবিদ্যার সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীর নৈতিক প্রেক্ষাপট খুব সহজে ব্যাখ্যা করা দুরুহ কাজ। নীতিবিদ্যায় অসংখ্য নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে। পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনায় এসকল মানদণ্ডকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ ব্যাপার নয়। মোটকথা পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল পরিবেশ ও নৈতিকতার একটি সমন্বিত পর্যালোচনা।

বর্তমানে দর্শনের আওতায় পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন-অধিবিদ্যক, মূল্যবিদ্যক, জ্ঞানবিদ্যক, নীতিবিদ্যক ইত্যাদি।
অধিবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা মানব সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যকার বাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করে। এখানে অধিবিদ্যক প্রশ্ন হলো: মানুষ কি প্রকৃতির অংশ?
মূল্যবিদ্যক দিক থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় আলোচনা করা হয় মানুষ স্বত:মূল্যের অধিকারী নাকি অ-মানব প্রাণী ও প্রকৃতি স্বত:মূল্যের অধিকারী।
পরিবেশ নীতিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যক বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। যেমন:- একজন কিভাবে জানতে পারে যে মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক কি এবং প্রকৃতির কি নিজের মূল্য আছে?
নীতিবিদ্যক দিক থেকে স্পষ্টতই পরিবেশ নীতিবিদ্যা নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলি বিবেচনা করে। যেমন:- অ-মানব প্রকৃতির প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা কি রয়েছে?
বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচনার পরিসর মূল্যবিদ্যা ও নীতিবিদ্যাকেন্দ্রিক।

৩. পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হলো পরিবেশগত সমস্যা। কয়েক দশক পূর্বেও পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা কেবল পরিবেশবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সমস্যাটি এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার পথে। তাই আজ সরকারি-বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সবক্ষেত্রেই পরিবেশ সমস্যা, তার প্রভাব ও সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একটা ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। একাডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উন্মেষ সাম্প্রতিক হলেও তার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন।

এখানে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক, প্রাণীবিদ ও উদ্ভিদবিদ জন ম্যুর (John Muir, ২১ এপ্রিল ১৮৩৮-২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪) ছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উপবন সংরক্ষণ এবং জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার

অন্যতম সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া তিনি সিয়েরা ক্লাবও (Sierra Club) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত আমেরিকান পরিবেশবিদ ডেভিড ব্রাওয়ার (David Brower, ১৯১২-নভেম্বর ৫, ২০০০) ম্যুরের (Muir) পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকের পরিবেশবিদদের একজন এবং সিয়েরা ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে আমেরিকান জীববিদ আলডো লিওপোল্ড (Aldo Leopold, ১৮৮৭-১৯৪৮) তাঁর "The Land Ethic" নামক প্রবন্ধে পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন (Leopold 113)। উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধ প্রকাশের ত্রিশ বছর পর বিষয়টি পরিবেশ নীতিবিদ্যা নমে পরিচিত হয়। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়াতে যখন পরিবেশ সমস্যা তেমন একটি পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি সেই সময় জীববিজ্ঞানী র‍্যাচেল কারসন (Rachel Carson) এর 'Silent Spring' নামক গ্রন্থটি আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারসন জোরালোভাবে বলেছেন যে, দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণার্থে বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছানাশকের বিশেষত DDT, অ্যালডিরিন এবং ডিইডিনিন ব্যবহার করে ফসলের ফলন এবং মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে বাণিজ্যিক চাষের প্রচলন হচ্ছে তা মূলত পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ (Carson)। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, অতিমাত্রায় এসকল রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জীবজগতের জীবনচক্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যার ফলে বসন্ত এসেছে কিন্তু ফুল ফোটেনি, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। মানুষের এরকম কর্মকাণ্ডের কারণে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটছে। কারসনের বক্তব্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং জৈব-চাষের উপর অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul R. Ehrlich ও Anne Ehrlich রচিত "Population Bomb"গ্রন্থটি পরিবেশবাদীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে (Jardins 77)। উক্ত গ্রন্থে তিনি জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এবং মানুষ ও অন্যান্য অমানব প্রজাতির মধ্যে অসম বণ্টনের ফলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কার ইঙ্গিত দেন। তাছাড়া ষাটের দশকে বিশ্বে ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে তখন কয়েকজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি প্রধানত দুটি প্রশ্নকে সামনে রেখে ১৯৬৮ সালে ক্লাব অব রোম প্রতিষ্ঠা করেন (Suter 1-5)। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে-

১. উন্নতির এ ধারা অব্যাহত রাখা যাবে কি না?
২. এরূপ উন্নতির জন্য বিশ্বের সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে যাওয়া সম্ভব হবে কি না?

১৯৭২ সালে এটি 'ক্রমোন্নতির সীমারেখা' নামে যে প্রথম রিপোর্টটি প্রকাশ করে তাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যকার সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা হয়। এভাবে ক্লাব অব রোম পরিবেশগত সমস্যাটির দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্তরের দশকে পরিবেশ দার্শনিকরা পরিবেশগত সমস্যাগুলির দার্শনিক দিক বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক লিন হোয়াইট এর "The Historical Roots of our Ecological Crisis"(White 155) এবং আমেরিকান বাস্তুবিদ গ্যারেট হারডিন এর "The Tragedy of the Commons" গ্রন্থে এ ধরনের আলোচনা স্থান পায় (Hardin 162)। তাছাড়া গ্যারেট হারডিন এর পরবর্তী আরেকটি প্রবন্ধ "Exploring New Ethics for Survival" এ পরিবেশের দার্শনিক ও নৈতিক দিকগুলো আলোকপাত করা হয় যা মূলত: সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সত্তরের দশকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা আমেরিকার দার্শনিকদের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল আমেরিকায় প্রথম 'ধরিত্রী দিবস' পালিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, এর স্বীকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধিই ছিল এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য (Hargrove 183)। এ দিবসটি বর্তমানে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল ১৭৫টি দেশে পালিত হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক একাডেমিক জার্নাল প্রকাশিত হয় ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে এবং ১৯৮০ এর দশকের প্রথমদিকে উত্তর আমেরিকায়। ১৯৭১ সালে জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন এবং জোয়েল ফেইনবার্গ নামক দুইজন নীতিবিদ তাঁদের পরিবেশ সংক্রান্ত মতামত প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালে জন বি. কোব রচিত *Is It Too Late? A Theology of Ecology* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (Cobb, 1972)। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির অবমূল্যায়ন হল খ্রিষ্টধর্মকে অবমূল্যায়ন যা মূলত পরিবেশ সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে 'মানব-পরিবেশ সংকট' শিরোনামে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক দার্শনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একই বছর ক্রিস্টোফার স্টোন "Should Trees Have Standing?"নামক প্রবন্ধে অমানব প্রকৃতির প্রতি বিদ্যমান আইনী নীতিগুলোকে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ১৯৭৩ সালে নরওয়ের দার্শনিক ও *Inquiry* জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা আর্নে নায়েস "The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movement" নামক প্রবন্ধে মানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন (দাস ১৫৪)। তাঁর নেতৃত্বে পরবর্তীতে গভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology) আন্দোলন বিকাশিত হয় যা অ-মানবকন্দ্রিক অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করে। আর্নে নায়েস আমাদের পুরো সভ্যতার পুনঃনির্মাণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। একই সময়ে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক রিচার্ড রাথলি পঞ্চদশ World Congress of Philosophy -তে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ "Is there a Need for a New, an Environmental, Ethic?" উপস্থাপন করেন যা পরিবেশ দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

১৯৭৩ সালে বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে দার্শনিক রিচার্ড সিলওয়ান একটি প্রস্তাব করেন। এতে তিনি প্রশ্ন করেন, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার প্রাক্কালে শেষ মানুষটি যদি নিজের প্রাণ হারানোর আগে সমস্ত জিনিসকে ধ্বংস করে দেয় তাহলে মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করা যায় কি (Routley 205-210)? পরবর্তী বছর ১৯৭৪ সালে অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক জন পাসমোর প্রথম পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর বই আকারে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন। বইটির নাম "Man's Responsibility to Nature"। তিনি এ গ্রন্থে রাথলির মতের বিরোধিতা করেন। পাসমোর বলেছিলেন, পরিবেশগত সমস্যা যেহেতু মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা সৃষ্ট সেহেতু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারাই এর সমাধান করা যাবে। তাই তিনি এটাকে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় মনে করেন, নীতিবিদ্যার নয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে হোমস রলস্টন পাসমোরের বিরোধিতা করে পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি *Ethics* নামক জার্নালে Is There an Ecological Ethics? প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে দর্শনের মূলধারায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্থান পায়। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে জন রডম্যান "Moral Extensionism" নামক ক্রিটিকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার কথা বলেন। এছাড়া ১৯৭৭ সালে জর্জ সেশনস পশ্চিমা সমাজের "Impenetrable Ontological Divide" নিয়ে নিন্দা করেছিলেন। যা মূলত অধিবিদ্যক দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতির সকল কিছু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়ই বরং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি স্পিনোজার একত্ববাদে (Monism) বাস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পান। এছাড়া তিনি কবি রবিনসন জেফার্সের (Robinson Jeffers) পরিবেশ নীতিবিদ্যা নিয়ে নতুন দিক আলোচনার প্রশংসা করেন।

একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে আমেরিকার নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেয়ার্ড ক্যালিকট নামক আমেরিকান পরিবেশ নীতিবিদ "Elements of Environmental Ethics" প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের জৈব ও অজৈব সদস্যের প্রতি মানুষের নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ক্যালিকট পরিবেশ নীতিবিদ্যার সমষ্টিবাদ এবং অমানবকেন্দ্রিক মতবাদকে বিকশিত করেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালে ডোনাল্ড ভ্যানডিভার প্রস্তাব করেছিলেন মৌলিক চাহিদা এবং পেরিফেরিয়াল চাহিদার মধ্যে পার্থক্য তৈরী করতে। মৌলিক চাহিদা নিয়ে যখন মানব এবং অমানব প্রাণীর মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয় তখন মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এটা মূলত Hierarchical Biocentrism এর কারণে হয়ে থাকে।

১৯৭৯ সালে নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও পরিবেশ দার্শনিক ইউজেন সি হারগ্রভ "Journal of Environmental Ethics" নামে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর প্রথম জার্নাল প্রকাশ করেন। এটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো থেকে প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনাকে আরও যুগোপযোগী ও অপরিহার্য করে তোলে এবং পরিবেশ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা "পরিবেশ নীতিবিদ্যা" নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্তরের দশকে মানুষের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে দুই ধরনের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে:

১. গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেখানে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পাসমোর এবং অ-মানবকেন্দ্রিকবাদকে সিংগার, স্টোন প্রমুখরা বিকশিত করেন।
২. অন্যটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সমষ্টিবাদের পক্ষে জোর দেয়। বস্তুত সত্তর এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এ প্রগতিবাদীদের আধিপত্য ছিল। তবে সেক্ষেত্রে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও অগ্রাহ্য করা হয়নি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালের পূর্বে পাসমোরের বিরোধিতা করে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। বৃটিশ দার্শনিক রবিন অ্যাটফিল্ড পাসমোরের বিরোধিতা করে প্রথম *The Ethics of Environmental Concern* নামক গ্রন্থটি এই বছর রচনা করেন। অ্যাটফিল্ড দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে প্রকৃতির প্রতি মানুষের প্রভুত্বের নয়, বরং সেবকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি দাবি করেন যে, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপাদান রয়েছে। পরবর্তীতে পাসমোরের গ্রন্থের প্রতিক্রিয়াস্বরুপ Donald Scherer এবং Thomas Attig সম্পাদিত *Ethics and the Environment*এবং Eugene C. Hargrove রচিত *Foundations of Environmental Ethics* নামক গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়।

ইতোমধ্যে আমেরিকান পরিবেশ দার্শনিক হোমস রলস্টন 111 ১৯৯০ সালে The International Society for Environmental Ethics প্রতিষ্ঠা করেছেন যার প্রেসিডেন্ট তিনি নিজেই। এটি বিশ্বজুড়ে বড় বড় দার্শনিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যা উন্নত বিশ্বের অনেক জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জায়গায় করে নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের পণ্ডিতরাও এর বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। প্রয়াত হেনরি ওডেরা ওরুকা কেনিয়ার নাইরোবিতে একটি ইকোফিলোসফি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন এবং ১৯৯১ সালে নাইরোবিতে পরিবেশ, বিকাশ এবং দর্শনের মধ্যকার যোগসূত্র নিয়ে বিশ্বদর্শনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এর আরও একটি উদাহরণ হল ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আজিজান বাহারউদ্দিন দ্বারা মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত উন্নয়ন, নীতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত এই আলোচনা পরবর্তীকালে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ দার্শনিকরা প্রায়শই দারিদ্র্য ও অন্যায্যতার সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সাথে পরিবেশবাদকে সংমিশ্রণ করে ফেলে। মূলত এভাবেই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বিকাশ লাভ করে বর্তমানে অবস্থানে এসেছে। পরবর্তীতে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মাধ্যমে প্রায়োগিক দর্শন বিকাশ লাভ করছে।

৪. পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব:

কোনো একটি জীব পরিবেশে এককভাবে বাঁচতে পারে না। জীবকে পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে অন্য জীবের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশের আনুকুল্য এবং সেই সাথে অন্যান্য জীবের মিথস্ক্রিয়া ব্যতীত কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এটাকে জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষিত হয়। যেমন: একটি পুকুর বা দীঘির মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী নির্ভরশীলতায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং দীঘির কোনো একটি প্রাণীর উপর সজীব এবং জড় উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করলেই নির্ভরশীলতার পরিবেশ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের হাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরিকল্পনামাফিক প্রাকৃতিক পারিবেশের রূপান্তর ঘটাতে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম পরিবেশ। এ কৃত্রিম পরিবেশের মধ্য থেকেই মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিকবোধগুলো নিয়ে টিকে থাকতে হয়। প্রত্যেক সমাজের মানুষই তাদের উপযোগী কিছু নৈতিক নিয়ম তৈরী করে তা না হলে মানুষের জীবন সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হতো। সমাজে জীবনধারণের জন্য যেমন কিছু নিয়মনীতির প্রয়োজন তেমনি সমাজের অপরিহার্য অংশ পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন। মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর জীবনধারক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের অঙ্গহানি বা ক্ষয় (যথা: প্রজাতির বিলুপ্তি বা মৃত্তিকা ক্ষয়) মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে ঋণাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের জন্য টেকসই পরিবেশগত উন্নয়ন বা পরিবেশের স্থায়িত্ব পরিচালনা অপরিহার্য। পরিবেশ পরিচালনের একটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি সাধারণ পরিবেশ নীতির আওতায় আনা। দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এর নানা শাখা-প্রশাখা বিকাশ লাভ করেছে। নীতিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর তিনটি ধারা লক্ষণীয়। এগুলো হলো-প্রচলিত নীতিবিদ্যা, পরানীতিবিদ্যা এবং প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছে মানুষে মানুষে যেখানে এত দ্বন্দ্ব সেখানে পরিবেশ বিপর্যয় হওয়া অবধারিত। প্রতিনিয়ত বিশ্বে যেসকল অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার নৈতিক সমাধান দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেখানে পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর নৈতিক সমাধান অকল্পনীয়। তবে পরিবেশগত আলোচনাসমূহ অনেকটা তাত্ত্বিক হলেও এর ব্যবহারিক গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কীটনাশকের ব্যবহার, প্রযুক্তি এবং শিল্প যখন পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে শুরু করে তখনই পরিবেশ নীতিবিদ্যার উত্থান হয়েছে। সুতরাং, একে পরিবেশ রক্ষার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় কেবল মানুষের স্বার্থরক্ষার কথাই বলা হয় না, বরং এখানে অন্যান্য অমানব প্রাকৃতিক সত্তার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এটি মূলত মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যকার নৈতিক সম্পর্ককে বিবেচনা করে এবং পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে তা আলোচনা করে। যেমন:

১. মানুষের ব্যবহারের স্বার্থে বন ধ্বংস করা উচিত কিনা?
২. আমরা কি জেনেশুনে অন্যান্য প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হবো?
৩. পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য মানুষকে কি সাধারণ জীবনযাপনে বাধ্য করা উচিত?

যেহেতু পরিবেশ নীতিবিদ্যার কোনো নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কোড হেন, তাই পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে, আমরা বিশ্বের সম্পদ এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রতি কেমন আচরণ করবো তা সহজভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও পরিবেশ নীতিবিদ্যা তার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পদ লুণ্ঠনের গুদামঘর নয় বরং জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যক রিজার্ভ। প্রাকৃতিক সম্পদের যত্রতত্র ব্যবহার আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। আমরা বাড়িঘর তৈরির জন্য গাছপালা কাটছি। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ চলছে। সম্পদের অযৌক্তিক, অনিয়ন্ত্রিত ও অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এগুলো কি নৈতিক? । যখন শিল্প প্রক্রিয়াগুলো সম্পদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তখন এ নিখোঁজ সম্পদের পুনরুদ্ধার করা শিল্পের দায়িত্ব নয় কি? কিংবা তারা কি পারবে পরিবেশকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে? এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়। তাই বলা যায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা কেবল বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন সাধনের কথাই বলে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবীর কথাও বিবেচনা করে।

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এ পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। মানুষের জীবনের প্রায় সব মৌলিক চাহিদার সংস্থান হয় পরিবেশের মাধ্যমে। কিন্তু এই মানুষেরই স্বেচ্ছাচারী ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডের ফলে দিন দিন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। এগুলো অনৈতিক নয় কি? তাছাড়া নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে প্রাণীদের আবাসস্থলের ক্ষতি হচ্ছে বিধায় তারা মানববসতিতে প্রবেশ করছে। এতে সেখানে বসবাসকারী জনগণের কাছে তা হুমকিস্বরূপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে রক্ষার জন্য এ ধরনের বন্যপ্রাণীকে হত্যা করে। আবার প্রাণীরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার জন্যও তাদেরকে হত্যা করা হয়। এছাড়া প্রাণীদের উপর গবেষণাও তাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। এভাবে দিন দিন বহু প্রাণীর বিলুপ্তি হচ্ছে। তাই বলা যায় আমরা কীভাবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারি? আমরা কীভাবে তাদেরকে বাসস্থান এবং খাদ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারি ? কে আমাদের স্বার্থের জন্য তাদের ক্ষতি করার অধিকার দিয়েছে? পরিবেশের প্রতি উচিত্য- অনৈচিত্যের এ সব বিষয়গগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্তর্গত যা আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন।

যারা মনে করেন যে, প্রকৃতির কোন মূল্য নেই তাদের কাছে পরিবেশ নীতিবিদ্যারও কোন মূল্য নেই। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রকৃতির যেহেতু স্বতঃমূল্য নেই তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলেও কিছু নেই। আমেরিকান পরিবেশ নীতিদার্শনিক হোমস রলস্টন এ শর্তকে প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে মূল্য আছে তা উল্লেখ করেন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের চৌদ্দটি মূল্যের কথা বলেন। এগুলো হল: জীবনসহায়ক মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, বিনোদনমূলক মূল্য, নান্দনিক মূল্য, বহুমাতৃক প্রজনন সম্পর্কিত মূল্য, ঐতিহাসিক মূল্য, চরিত্র গঠনকারী মূল্য, বৈজ্ঞানিক মূল্য, সাংস্কৃতিক-প্রতীকী মূল্য, জীবনের মূল্য, ধর্মীয় মূল্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল্য, স্থায়িত্ব ও স্বত:স্ফূর্ত মূল্য, দ্বান্দ্বিক মূল্য (খালেক ৩৩৮)। এই মূল্যগুলো প্রকৃতির সকল সম্পদের স্বত:মূল্যের কথা বলে।

মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে অস্বীকার করলে পুরো নীতিবিদ্যাকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ পরিবেশ ও মানব জীবন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতিতে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু, প্রাণী, পশুপাখি, জলবায়ু, উদ্ভিদ,

মাটি, অণুজীব প্রভৃতি একে অন্যের সাথে সহাবস্থান করছে। যাকে আমরা বাস্তুসংস্থান বলি। জৈবিক ও বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ পরিবেশরই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্তান এবং এ প্রাকৃতিক পরিবেশেই সে তার আপন অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষকে সমাজের অন্যান্য সবকিছুরই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এর সাথে বসবাস করতে হয়। ফলে একজন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের উচিত তাদেরকে নৈতিকভাবে শ্রদ্ধা করা।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও টেকসই পৃথিবী উপহার দেয়ার পক্ষে কথা বলা। এখানে বলা হয় যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু পরিবেশগত অবনতি ও সম্পদের হ্রাসের ফলে আমরা আমাদের ভাবিষ্যৎ প্রজন্মকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছি যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাদেরকে ভালো পরিবেশ উপহার দেয়া কি আমাদের দায়িত্ব নয়? লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অ-নবায়নযোগ্য সম্পদগুলি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদেরকে প্রতিস্থাপিত করাও সম্ভব নয়। আমাদের উচিত প্রয়োজন ও সম্পদের পরিমাণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যবহার করা যাতে পরবর্তী প্রজন্ম উপকৃত হয় এবং বাসযোগ্য পৃথিবী পায়। আমরা নৈতিকভাবে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজনকে বিবেচনা করতে বাধ্য। পরিবেশের উপাদানগুলো কেবল মানবসত্তার জন্য নয়, বরং এগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নৈতিকতার দাবি রাখে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির অ-মানব সত্তার প্রতি মানুষের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। উন্নয়ন ও সুবিধার জন্য আমরা জ্বালানি নিঃসরণের মাধ্যমে যে দূষণ করি তা কি ন্যায্য অধিকার? প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ও যথেচ্ছ ব্যবহার কি পরিবেশের জন্য নৈতিকভাবে সঠিক? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পরিবেশ নীতিবিদ্যা থেকে পেয়ে থাকি। জলবায়ু পরিবর্তন উদ্ভিদের বৈচিত্রতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি সত্য যে, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ কেবল মানুষের জন্য নয় বরং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জন্য যা ক্ষতিকর তা আমাদের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা আমাদের বেঁচে থাকা তাদের উপর নির্ভর করছে। এ থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পরিবেশের প্রতি আমাদেরও কর্তব্য আছে এবং অন্যান্য জীবসত্তাগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এমনকি যদিও মানবসত্তাকে পরিবেশের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, প্রাণী ও উদ্ভিদের গুরুত্বও কম নয়। তাদেরও সম্পদের ন্যায্য ভাগ এবং একটি নিরাপদ জীবন পরিচালনার অধিকার আছে। এগুলো পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

নৈতিক দায়িত্ব বলতে সাধারণ জ্ঞান, সমতা, পছন্দ এবং মূল্যের গুরুত্বকে বুঝায়। তাই এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি একজন ব্যক্তি নৈতিকভাবে কোনোকিছু করার জন্য দায়বদ্ধ হয় তাহলে তিনি-

১. প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানেন;
২. এটি সম্পাদন করতে সক্ষম;
৩. কোনো কিছু করবেন কি করবেন না তা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারেন; এবং
৪. তার কার্যক্রম/কর্মদক্ষতা অন্যান্য সত্তার ক্ষেত্রে মঙ্গল বয়ে আনে। কারণ এ প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতিক্রিয়া একজন নৈতিক ব্যক্তি হিসাবে তার মূল্যের উপর প্রতিফলন ঘটায়।

তাই সমাজের ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিকতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তির কঠোর সংকল্প এবং পরিবেশগগত নীতিবাক্য পৃথিবীর জীবনধারায় অনেক পরিবের্তন আনবে। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা পাঠের

ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, মানুষ নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক পাহাড়ঘেরা, ছায়া সুনিবিড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয় যা এখানকার সবাইকে নানাভাবে আন্দোলিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে ঘন বনাঞ্চলবেষ্টিত পাহাড়, নানা প্রজাতির জীবজন্তু, পাখি রয়েছে। ছুটির দিনগুলোতে অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্য এখানে আসেন এবং এখানে শিক্ষানুরাগীদের জন্য গবেষণার জন্য অসংখ্য উপকরণও রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত পাহাড়গুলোর তলদেশে নানা মূল্যবান ধাতব সামগ্রী রয়েছে। এসব ধাতব সামগ্রী উত্তোলনের জন্য পাহাড় খুঁড়তে হবে। এতে করে অসংখ্য গাছপালা ধ্বংস হবে, জীবজন্তু ও পশুপাখি তাদের আবাসস্থল হারাবে। অপরদিকে, মূল্যবান ধাতু উত্তোলন করলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেবে যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের করণীয় কি হবে? আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখবো, নাকি মূল্যবান ধাতব পদার্থ উত্তোলন করবো? একমাত্র নৈতিক নীতিমালাই পারে এ নৈতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে। এখানেই মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিহিত।আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অভাবগুলোকে পূরণ করার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতিবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার দিকগুলোর অনুশীলন করা।

তথ্যসূত্র

Attfield, Robin. *The Ethics of Evironmental Concern*. London: The University of Georgia Press, 1983.

Carson, Rachel. *The Silent Spring.* Houghton Miffin Company, 1962.

Cobb, John B.. *Is Too Late? A Theology of Ecology*. Bruce: Beverley Hills, 1972.

Jardins, Joseph R. Des. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. Wardsworth, 2013.

Hardin, Garrett. The Tragedy of the Commons. *Science*, Vol. 162, Dec, 1968. Hargrove, Eugene C. Weak Anthropocentric Intrinsic Value. *The Monist*, 1992.

Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac*. London: Oxford University press, 1949.

Lillie, William. *An Introduction to Ethics*.London: Methuen & Co. Ltd., 1964.

Mackenzie, J.S. *A Manual of Ethics*. London: Univ. Tutorial Press Ltd., 1964.

Passmore, John,.*Mans Responsibility for Nature*. England: Duckworth, 1974, (2nd edition 1980).

Routley, R. Is There a Need for a New, An Environmental Ethic? *Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy*.Varna: Sofia Press, 1973,

Scherer, Donald & Attig.Thomas *Ethics and the Environment*. New Jersey: Prentice Hall, 1983.

Eugene C. Hargrove. *Foundations of Evironmental Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

Suter, K. The Club of Rome: The Global Conscience. *Contemporary Review*, 1999.

White, Lynn .The Historical Roots of our Ecological Crisis.*Science*, Vol. 155, March, 1997.

খালেক, এ. এস. এম.আব্দুল। *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন, ২০০৯।

দাস, কালীপ্রসন্ন। "পরিবেশ নীতিবিদ্যা: উদ্ভব ও বিকাশ", *কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন*। রাজশাহী: মফিজউদ্দিন আহমদ স্মৃতিসংসদ, ২০০৩।